ফোকলোর গবেষণা পত্রিকা
Research Journal of Folklore
International Peer-reviewed Journal of Folklore
Volume 01 : December 2020
ISSN : 2709-9652

বাউল কবি খোদা বক্স সাঁই রচিত শ্যামাসংগীত : স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য

মো. আল-জোবায়ের*

Abstract

In the Post-Lalon period, Khoda Box Sai (1928-1990) has a prominent position in the genre of Baul music in Bangladesh. Like Lalon, Khoda Box Sai's songs are also varied. Especially his Shyama music has special features. Khoda Box Sai was a Muslim by birth; was a follower of Islam. After his debut as a Baul, a kind of change took place in his ideology. He has freed himself from communal discrimination and has revealed his own identity by composing and performing music in the style of Hindu, Vaishnava, and Shakta verses. There may be other reasons too, and that is after initiation in Baulm, he stayed in the homes of many people Hindu and made sadhusango with them. As a result, Krishna's group songs, Vaishnava songs, and Shyama songs have a special space in his music. In this article, the nature and uniqueness of Khoda Box Sai's Shyama Sangeet have been analyzed from the point of view of folk culture. In addition to his written text, the information gathered through the field observation and interview has been used as needed.

মুখ্য শব্দ : লালন সাঁই, রামপ্রসাদ, কাজী নজরুল ইসলাম, খোদা বক্স সাঁই, শ্যামাসংগীত, শক্তিসাধনা, শ্যামাসাধনা ।

লেখক-যোগ: zobayer@du.ac.bd

দশমহাবিদ্যার প্রধানতম দেবী শ্যামা বা কালীর মাহাত্ম্য-কীর্তনমূলক সংগীতসমূহ শ্যামাসংগীত নামে পরিচিত। শ্যামা ও শ্যামাসংগীতের সঙ্গে শ্যামাসাধনার বিষয়টিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং বাংলাদেশে এই শ্যামা বা কালী একজন বিশিষ্ট দেবী হিসেবেই স্বীকৃত। 'কালী শক্তির দেবী হিসেবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিকট পূজিত হন। শাক্ত মতেও কালী শক্তির মূলাধার।' (মুস্তাফা ১৭) যদিও সর্বজনীন দেবী হিসেবে তার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তেমন প্রাচীন নয়। শশীভূষণ দাশগুপ্ত লক্ষ করেছেন যে, পার্বতী, উমা, সতী এবং দুর্গা-চণ্ডিকার ধারা মিলে পুরাণে যে এক মহাদেবীর বিবর্তন দেখা যায় তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে আর একটি ধারা, যা কালিকা বা কালীর ধারা হিসেবে পরিচিত। 'এই কালী বা কালিকাই বাঙলাদেশের শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরী হইয়া উঠিয়া দেবীর অন্য সব রূপ অনেকখানি পিছনে ফেলিয়াছেন।' (দাশগুপ্ত ৬৩) কালী বা শ্যামার জনপ্রিয়তার মূল কারণ দেবী হিসেবে তিনি যতটা না শাস্ত্রীয় তত্ত্বনির্ভর, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবীয়। এতদঞ্চলের মানুষের মানসসৃজনকল্পিত বলেই তিনি অর্জন করেছেন শিখরস্পর্শী ভক্তপ্রিয়তা। শ্যামা বা কালীর গায়ের রঙ যে কৃষ্ণবর্ণ তাও এ অঞ্চলের মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। পূজারী ভক্তগণ শ্যামাকে অভিষিক্ত করেছেন মাতৃত্বের মর্যাদায় আর নিজেদেরকে তার সাধক-সন্তানরূপে পরিচয় দিয়ে তারাও অনুভব করেছেন অশেষ গৌরব। শ্যামাসংগীত মূলত শ্যামাভক্তদের দ্বারাই রচিত ও চর্চিত হয়। এই সংগীতে দেবীর উদ্দেশে ভক্তের আবেগ-উচ্ছ্বাস, অভাব-অভিযোগ, অনুরাগ-অনুযোগ, আশা-আনন্দ, দুঃখ-বেদনা প্রভৃতি বিষয় বাণীরূপ লাভ করে। ঐতিহাসিক বিচারে সাধনতত্ত্ব হিসেবে শ্যামাসংগীতের উদ্ভব হলেও সমাজ ও লোকজীবনের সঙ্গে রয়েছে এর গভীরতর সম্পৃক্ততা এবং এই সংগীতসমূহের বিষয়াংশের মানবিক আবেদন বিচারে তা শেষ পর্যন্ত জীবনমুখী সংগীতের মর্যাদা লাভ করেছে। ফলে সনাতন ও শাক্তমতের অনুসারী কবিরা যেমন শ্যামাসংগীত রচনা করে দেবীকে প্রণতি জানিয়েছেন তেমনি ভিন্ন ধর্ম ও মতাদর্শের অনেক কবিও মানবিক আবেদন থেকে শ্যামাসংগীত রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন।

শ্যামাসংগীতের ধারায় খোদা বক্স সাঁই

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধক কবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের (আনুমানিক ১৭২০-১৭৮১)[১] হাত ধরে বাংলা গানের জগতে শাক্তপদাবলি বা শ্যামাসংগীত বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনিই প্রথম কালী-সাধনাকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডির ঊর্ধ্বে একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দিতে সচেষ্ট হন। রামপ্রসাদ তাঁর শ্যমাসংগীতকে 'শাস্ত্রানুমোদিত আচার পরায়ণতা ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ থেকে মুক্ত করে তাকে সাধারণ মানুষের কর্মপীড়িত জীবনের সহজিয়া মাতৃব্যাকুলতা ও সংস্কারহীন ভক্তিতে পরিণত করেছিলেন।' (গোস্বামী ৭৩২) এরপর কমলাকান্ত (১৭৬৯-১৮৮১), কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮৩), শম্ভুচন্দ্র রায়, হরু ঠাকুর (১৭৪৯-১৮৪২), অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি (১৭৮৬-১৮৩৬), নিধু বাবু (১৭৪১-১৮৩৯), কালী মির্জা (১৭৫০-১৮২০), দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭), গোবিন্দ চৌধুরী, রামকৃষ্ণ দেব (১৮৩৬-১৮৭৬) প্রমুখ কবি শ্যামাসংগীত রচনায় নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বিশ শতকের কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বিচিত্রধারায় সংগীত রচনার পাশাপাশি শ্যামাসংগীত রচনায়ও বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আরও পরবর্তীকালে লালন শাহের ভাবশিষ্য খোদা বক্স সাঁই স্বল্পপরিসরে রসোত্তীর্ণ শ্যামাসংগীত রচনা করে ভক্তমহলে হয়েছেন সমাদৃত। তাঁর রচিত শ্যামাসংগীতের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। 'সহজ-সরল ভাষা, স্পষ্ট বক্তব্য এবং ভাবের গভীরতা তাঁর সংগীতের বৈশিষ্ট্য।' (হক ৭৯)

নজরুল যেমন 'শাক্তমায়ের শক্তিমান সন্তান' তেমনি খোদা বক্স সাঁইও শাক্তমায়ের পরম ভক্ত; অনুরাগী সন্তান। পরম ভক্তিভরে তিনি শ্যামা মায়ের উদ্দেশে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। কখনো এই মাকে মনে

[১] করুণাময় গোস্বামী তাঁর *সঙ্গীতকোষ* গ্রন্থে রামপ্রসাদ সেনের জীবনকাল ১৭২০-১৭৮১ নির্দেশ করেছেন।

হয়েছে একান্ত বাৎসল্য রসের আধার, আবার কখনো মনে হয়েছে অপার শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতিমূর্তি; পরম পূজনীয় দেবী। 'কবি তাঁর রচিত শ্যামাসংগীতে মাতৃবন্দনা, মাতৃভক্তি, মাতৃস্নেহ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। তাঁর শ্যামাসংগীত রসোত্তীর্ণ সংগীতে পরিণত হয়েছে, অধিক দৃষ্টান্ত না দিয়েও একথা বলা যায়।' (হক ৮০) মাতৃভক্তি ও মাতৃস্নেহ খোদা বক্স সাঁইয়ের শ্যামাসংগীতসমূহের প্রাণৈশ্বর্য। আবার অসুরবিনাশী এই দেবীর পদতলে আশ্রয় প্রার্থনা করে কবি তাঁকে বিশ্বমাতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন। মূলত খোদা বক্স সাঁই তাঁর শ্যামাসঙ্গীতে শ্যামাকে জাতি-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে এক মহামাতৃরূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন।

শ্যামামায়ের রূপবর্ণনামূলক গান

শাক্তসাধক রামপ্রসাদের হাত ধরে শ্যামাসংগীতে যে নবযাত্রা সূচিত হয়েছিল পরবর্তীকালের কবিদের গানেও তার ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। রামপ্রসাদ তাঁর গানে একদিকে যেমন শ্যামামায়ের মহিমা কীর্তন করেছেন অন্যদিকে মায়ের প্রতি সন্তানের আর্তিকেও তিনি অপূর্ব সুর ও ছন্দে বাণীবদ্ধ করেছেন। নজরুলের পরবর্তী পর্যায়ে লালনপন্থী কবি খোদা বক্স সাঁইও শ্যামা মায়ের অপরূপ রূপবিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি জানিয়েছেন প্রণতি। শ্যামার শ্যামল- সুন্দর নিরাভরণ রূপ তাঁর কবিচিত্তে জাগিয়েছে ভক্তিতরঙ্গ ও আনন্দের হিল্লোল। শ্যামার সুমধুর হাসি, শুভ্র দন্ত, নীল কমল-লোচন, পূর্ণশশীরূপ ললাটের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি প্রেমানন্দে অহর্নিশ মগ্ন থাকেন। কবির গানে রয়েছে এর স্বীকৃতি:

সুনির্মল তনু, শ্যামল সুন্দর,
কমল মৃণাল, সম বাহুদল,
মহাভাবের ভাবিনী বলবো কি বাখানি,
প্রেমানন্দে মগন রাত্র দিবা কি॥ (সাঁই পাণ্ডুলিপি)

কবি তাঁর মনোলোকের সমস্ত সৌন্দর্যানুভূতি দিয়ে শ্যামার রূপকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। শ্যামাকে কবি অন্তর্লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে চিহ্নিত করে তাঁর রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন অসামান্য মুগ্ধতায়। যেমন:

দুটি উরু কদলি তরু আকার,
ক্ষীণ কটিতটে কি যে সুবাহার,
কমল চরণে তিল চমৎকার,
হেঁটে যায় রাজ হংসিনী॥

যে দেখেছে সেই চাঁদেরে,
পড়েছে সে বিষম ফাঁদে,
ঐ রূপ সদা অন্তরে রেখে,
দীন বক্স চলে দিন রজনী॥ (সাঁই পাণ্ডুলিপি)

উপর্যুক্ত রূপবর্ণনায় কবির প্রকৃতিচেতনা ও নন্দনবোধ যুগপৎ পরিস্ফুট হয়েছে। গ্রামীণ জীবনের "কদলি তরু" হতে "রাজ হংসিনী" ও "চাঁদের" রূপমাধুরী খোদা বক্স বেশ দক্ষতায় দেবীর দেহসৌষ্ঠবে স্থাপন করেছেন।

সাধক কবিদের মতো এই কবিও কালীর রূপবর্ণনায় কালীকে কৃষ্ণকায় বলে স্বীকার করেন নি। বরং রামপ্রসাদ যেমন বলেছেন 'শুনেছি মা'র বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো।' তেমনি খোদা বক্স সাঁইও কালীকে আলোর আধার বলে চিহ্নিত করেছেন। শ্যামা বা কালীর রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে খোদা বক্স সাঁইয়ের এই বিশিষ্টতা সহজেই উপলব্ধি করা যায় :

নয়ন কমলে কাজরেরি আভা,
অপরূপ সে কি রূপের শোভা,
দেখিলে জুড়ায় প্রাণ ভোলে দেহ মন ॥ (সাঁই পাণ্ডুলিপি)

অর্থাৎ তান্ত্রিকতামুক্ত 'মানস-পূজার' অনুষঙ্গরূপে শ্যামাসংগীত রচনার যে ধারা সূচিত হয়েছিল রামপ্রসাদের হাতে, খোদা বক্স সাঁই তাকেই করলেন বহুবিস্তৃত ও দূরপ্রসারী।

শ্যামামায়ের পরিচয় : চণ্ডীরূপ, মাতৃরূপ, বিশ্ব-মাতৃরূপ

শ্যামার স্নিগ্ধ-শোভন নির্মল রূপে কবি যেমন মোহিত হয়েছেন তেমনি তাঁর অসুরবিনাশী রণমূর্তিকেও তিনি মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর সংগীতে। সমাজে বিদ্যমান অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভশক্তির উদ্বোধনে মায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক। একারণে কবি শ্যামাকে আহ্বান জানিয়েছেন সকল অন্যায়, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে রণমূর্তি প্রদর্শনের। প্রাসঙ্গিক সংগীতাংশ লক্ষণীয়:

১. সুচাচুর চিকুর কেশ, এলায়ে হও রণঙ্গিনী বেশ,
কুচ যুগ শোভা কিবা আভা, যেন নক্ষত্র পড়িছে খসি ॥
এক হস্তে অভয় দেও মা, আরেক হস্তে ধর অসি,
অসুর নিধন কর গো মা, মুণ্ড কাট রাশি রাশি ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

২. করেছিলে মা ভূ-ভার হরণ,
সংহার কর দানব দৈত্য-গণ,
অধীন বক্স করে নিবেদন,
ঘুরিও না মা মিছে মিছে ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

হৃদয়জাগতিক আকুলতা নিয়ে শ্যামাকে স্মরণ করতে চান কবি। কিন্তু পৃথিবীর মিথ্যে মোহ-মায়ায় কবির অন্তর্লোক সদা আচ্ছন্ন থাকায় কবির সে অভিপ্রায় প্রায়শ পূর্ণ হয় না। একারণে মায়ের হাত ধরে শিশু যেমন সঠিক পথের সন্ধান পায়, কবিও তেমনি শ্যামামায়ের কাছে পথের দিশাপ্রাপ্তির জন্য আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন। এ-পর্যায়ে কবির মনোলোকে দেবী যেন অধিষ্ঠিত হয়েছেন একান্ত মাতৃরূপে। প্রাসঙ্গিক কবিতাংশ লক্ষণীয়:

১. শিশু যেমন মাকে ডাকে
মা ছাড়া মানে না কাকে,
শিশুর মতো করে আমাকে,
পথে নিও হাত ধরি ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

২. এসেছি মা এই অবনী,
পূজিতে মা এই রাঙ্গা চরণখানি,
দীন বক্স তোর অবোধ ছেলে,
মা হয়ে করিস সান্ত্বনা ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

এই বিরূপ বিশ্বে বিস্তর দুর্যোগ-দুর্বিপাক ও বিঘ্নসংকুল পথপরিক্রমায় কবি এই মায়ের স্নেহচ্ছায়া ও আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে চান না। কারণ কবি জেনেছেন তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম পরিত্রাতা। ফলে তাঁর সাহচর্য কবির অনিবার্য সহায়। কবি যেমন মায়ের আশীর্বাদে ধন্য হয়েছেন, তেমনি সকলেই যাতে তাঁর কৃপালাভ করতে পারেন সেজন্যে কবি শ্যামামাকে আহ্বান জানিয়েছেন। কবির এই আহ্বানের মূলে আছে কবির ভুবনবিস্তারী মানব কল্যাণকামী ভাবাদর্শ। তিনি জানিয়েছেন:

১. ভুবন মোহন রূপ যে তোমার,
সকলের মা হও নিরন্তর,
বাবার ও মা মায়ের ও মা ভাইয়ের ও মা ...॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

২. সবার হও অন্তর্যামী,
আমি কেবল ভোলে ভ্রমি,
পাইনে তোমার ঐ রূপ দর্শন ॥
বিশ্ব জননী, তোমার এ ধরণী,
কর যে পরিত্রাণ,
তব কৃপা বলে অনল সলিলে,
বাঁচাও সবার প্রাণ ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

কবি বিশ্বাস করেন – এই বিশ্বসৃষ্টির মূলে আছেন একজন মা। এই মায়ের জঠর থেকেই সকল দেব দেবীর সৃষ্টি। তিনি আদ্যাশক্তি এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র রয়েছে তার নিরঙ্কুশ উপস্থিতি। এই বিশ্বময়ী মায়ের পরিচয় উপস্থাপন করে কবি বলেছেন:

মা যে আমার কৃপাময়ী চিরস্থায়ী,
পালন করিছে এ সংসার,
তার সাক্ষী বসুমতি যাতে হয় সৃষ্টি স্থিত,
প্রলয় সংহার ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

কবির এই বিশ্বজননী কোনো ধাতু-প্রস্তর কিংবা মৃত্তিকানির্মিত বিগ্রহে অবস্থান করেন না; এবং এ-মুর্তিকে পূজা করে বিশ্বজননী তথা মহাশক্তির প্রার্থনাও সম্ভব নয়:

ধাতু প্রস্তর স্বর্ণ মৃত্তিকা,
কাগজেতে হয় মূর্তি আঁকা,
তাতে যায় কি মায়ের ধরে রাখা,
তাতে পূজা হয় কেমনেতে ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

কোনো সুনির্দিষ্ট মূর্তিবিশেষে এই বিশ্বমাতা অবস্থান করেন না; তাঁর একমাত্র অবস্থান মানুষের হৃদয়পটে। সেখানে জাতিভেদ নেই, ধর্ম ও বর্ণগত বৈষম্য নেই। কবি এক সর্বমানবিক আবেদন থেকে এই মায়ের নির্বিশেষ রূপাঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন:

মা কথাটির নাই জাতিভেদ,
কোনো ধর্মে নাইকো নিষেধ, বলতে যে কার,
যে জন ডাকে ভক্তি ভাবে,
সেই যাবে হইয়ে উদ্ধার ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

সম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে শ্যামাকে সর্বজনীন মাতৃকল্পরূপে উপস্থাপনের যে প্রচেষ্টা রামপ্রসাদে প্রথম পরিলক্ষিত হয়েছিল উত্তরকালের কবি খোদা বক্স সাঁইয়ের গানেও লক্ষ করি তার সদর্থক প্রকাশ।

শ্যামামায়ের বন্দনা

খোদা বক্স সাঁইয়ের অধিকাংশ শ্যামাসংগীতে শ্যামামায়ের বন্দনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। শ্যামামায়ের বিচিত্ররূপকে কবি যেমন স্মরণ করে প্রণতি জানিয়েছেন তেমনি মায়ের আশীর্বাদপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য তীব্র ব্যাকুলতাও তাঁর এসকল গানে বাণীরূপ লাভ করেছে। শ্যামামায়ের স্তুতি বা বন্দনা করে কবি বলেছেন:

নিরানন্দ করিস নে মা শুন গো আনন্দময়ী,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে তুমি আছ চিরস্থায়ী ॥
তোমার ভাবে থাকে যারা মণিহারা ফণী পরা,
দেখলে দুটি নয়ন তারা মনে হয় সে জগন্ময়ী ॥
নানা স্থানে নানান ময়, থাক তুমি ভক্তের হৃদয়,
মহানন্দে হও মা উদয়, সময় কি আর অসময় ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

শ্যামাকে বৈচিত্র্যময় রূপেই কবি স্মরণ ও বন্দনা করেছেন। আদ্যাশক্তি, আনন্দময়ী, জগজ্জননী, ভৈরবী ভাবিনী, শ্যামা শঙ্করী, ভয়হারা, গিরিরাজ নন্দিনী, দর্পহারা, কৈলাশবাসিনী, উমা, তারা, মাতঙ্গিনী, এলোকেশী উন্মাদিনী, মহিষমর্দিনী, অকালবোধনী, দশভুজা, ত্রিনয়নী প্রভৃতি নামে শ্যামাকে স্মরণ করেছেন কবি। একটি সংগীতের অংশ বিশেষ লক্ষণীয়:

মা যে আমার দয়াময়ী ব্রহ্মাণ্ডের পালন করা,
ভৈরবী ভাবিনী শ্যামা শঙ্করী ভব ভয়হারা ॥
গিরিরাজ নন্দিনী তুমি, দর্পহারী নাম যে তারা,
রণবেশে উলঙ্গিনী অশিধারী ভয়ংকরা ॥
কৈলাশবাসিনী মাগো, মণিময় মনহরা,
লাটেতে পূর্ণ শশী অন্ধকারে আলো করা ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

কবির এই বহুধা বিশেষণে যেমন শ্যামা হয়ে উঠেছেন বিচিত্র শক্তির আধার তেমনি শ্যামাসংগীতের অন্যান্য কবিদের সঙ্গে খোদা বক্স সাঁইয়ের অবস্থানও হয়েছে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

শ্যামার সাধন-ভজন পদ্ধতি

খোদা বক্স সাঁই মনে করেন শ্যামাদেবী জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্রই বিরাজমান। ব্যক্তিচিত্তেও তিনি অস্তিত্বমান। মানুষ তার বিশ্বাস ও ভক্তির মাধ্যমেই কেবল তার সান্নিধ্য অর্জন করতে পারে। অন্তরে অবিশ্বাস ও পঙ্কিলতাকে লালন করে তাঁকে সহস্রবার ডাকলেও তিনি সাড়া দেন না; কিন্তু হৃদয়ের গভীর অনুভবে-উচ্চারণে প্রার্থনা জানালে তিনি পরমানন্দে সাড়া দেন। কবির এই ভাবনার স্বীকৃতি লক্ষ করা যায় তাঁর নিম্নোক্ত গানে:

জলে স্থলে ফলে ফুলে, চিন্তা করলে সর্বস্থানে মেলে
অবিশ্বাসে হাজার ডাকলে, মা আসে না কোনো কালে ॥
ভক্তি বলে নয়ন জলে, ডাকলে মা দেয় না ফেলে,
হৃদপদ্ম রক্তজবা দিয়ে ডাক দীন এই বক্স বলে ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

জাগতিক সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে উঠে কবি দেবীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তাঁর এ-প্রার্থনা শর্তহীন। তাই কবি অবলীলাক্রমে বলে দিতে পারেন 'ও মা বাসুক না বাসুক ভালো/ তবু ঐ চরণে থাকবো পড়ে' (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)। কিন্তু দীন-দরিদ্র কবি কী দিয়ে শ্যামামায়ের উদ্দেশে অর্ঘ নিবেদন করবেন– এই দুশ্চিন্তাও তাঁকে অহরহ আন্দোলিত করে। পরিশেষে কবি স্থির অভিজ্ঞানে উন্নীত হন এবং সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে বলেন:

কি দিয়ে যে করবো পূজা, পাই না আমি দেহ ধুড়ে,
মন ফুল আর নয়ন জলে, অঞ্জলি দেই সকল ছেড়ে ॥ ...
রক্ত জবা কোথায় পাবো তার রাঙ্গা পায়ে অর্ঘ দেব,
হৃদপদ্মে রাখবো মাগো দীন বক্সের এই ভাঙ্গা নীড়ে ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

কবির বিশ্বাস– ইষ্টদেবীর আশীর্বাদ পেতে হলে আন্তরিক নিষ্ঠা ও আনুগত্য প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন জাগতিক মোহ তথা কাম-ক্রোধ-লালসা থেকে মুক্তি। কারণ এগুলোই সাধনপথের অন্তরায়। দেবীর পাদপদ্মে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই কেবল তাঁকে পাওয়া যায়। এ-বিশ্বাস থেকেই কবি বলেন:

যদি মন মায়ের দাবি করবি পূরণ,
আগে নিষ্ঠা ভক্তির কর আয়োজন ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ সকল,
ছেড়ে দেও গে সে সব গণ্ডগোল
লক্ষ রেখে সে চাঁদ বদন, সম্বল মাত্র অভয় চরণ ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

কবির বিশ্বাস, পরিশুদ্ধ চিত্তে পরম ভক্তিকে সম্বল করে যদি শ্যামাকে ডাকা যায় এবং তিনি যদি কৃপা করেন তবে তখনই তাঁকে পাওয়া যায়। ভক্ত যখন কায়মনে মায়ের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হয় তখন ভক্তের অন্তর্লোক থেকে সকল জাগতিক অসূয়া-বিদ্বেষ বিদূরিত হয়, এবং সে পায় পরিশুদ্ধ জীবনপথের সন্ধান। কিন্তু কীভাবে মায়ের উপাসনা করতে হয় তা কবির অজানা। এদিক থেকে কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীতের সঙ্গে খোদা বকস্‌সাঁইয়ের সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। তাঁরা দুজনেই যেহেতু একটি বিশেষ ধর্মীয় ঐতিহ্যের অনুসারী হিসেবে উদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্যামাসংগীত রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন সেহেতু তারা কোনো কঠিন-কঠোর তত্ত্বকে অনুসরণ করেননি; বরং হৃদয়ের সহজাত প্রেমোচ্ছ্বাস নিয়েই তারা মানবিক অনুষঙ্গবাহী এ-সংগীত রচনা করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম দ্বিধাহীন চিত্তে দেবীকে জানিয়েছেন:

মা গো আমি তান্ত্রিক নই তন্ত্রমন্ত্র জানি না মা
আমার মন্ত্র যোগ-সাধনা ডাকি শুধু শ্যামা শ্যামা
যাই না শ্মশান-মশান, দিই না পায়ে জীবন বলিদান
খুঁজতে তোকে খুঁজি না অমাবস্যা ঘোর ত্রিযামা ॥
ঝিল্লী যেমন নিশীথ রাতে একটানা সুর গায় অবিরাম
তেমনি করে নিত্য আমি জপি শ্যামা তোমারি নাম॥ (আমান ও ঠাকুর ৪৪৮)

নজরুলের এই বক্তব্যেরই যেন প্রতিধ্বনি লক্ষ করি খোদা বকস্‌সাঁইয়ের গানে :

তুই আমায় যা শিখাবি মা,
তাই হবে উপাসনা সাধন, তন্ত্র মন্ত্র কিছুই জানিনে,
দীন বক্‌স রয় নাম রসেতে মগন ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

মূলত দুই কবিসত্তাই যে হৃদয়ের সহজাত ভক্তি ও প্রেমে শ্যামামায়ের সান্নিধ্য কামনা করেছেন তা তাঁদের উপর্যুক্ত পদদ্বয়ে স্পষ্ট।

বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যা অঞ্চলে দীপাবলির দিনটি কালীপূজার দিন হিসেবে উৎযাপিত হয়। লোকবিশ্বাস অনুসারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের উদ্দেশ্যে এসময় মানবলোকে শ্যামার আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এই বিশেষ দিনটির পরে দেবীর সঙ্গে কবির ঘটে যায় দীর্ঘ বিচ্ছেদ। ফলে কবিহৃদয়ে জন্ম নেয় শ্যামামায়ের সাক্ষাৎ পাবার জন্য তীব্র আকুলতা। কৈলাশ, কাশী কিংবা কামাখ্যার মন্দিরে খুঁজেও যখন দেবীর সন্ধান পেতে ব্যর্থ হন তখনও কবি ভগ্নচিত্তে দেবীর কাছে কাতর অনুনয়ে বলেন– তিনি যদি কবির ভাঙা আঙিনায় আবির্ভূত হন তবে কবি তাঁকে সযতনে আগলে রাখবেন:

কৃপা করে যদি আস মা, আমার এই ভাঙা আঙিনায়,
দীন বক্‌স বলে হৃদ কমলে, সযতনে রাখবো তোমায় ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

বিষয়-বৈভবের প্রতি খোদা বক্স সাঁইয়ের কোনো মোহ ছিল না। তাঁর মতে, তিনি সাধন-গুরুর নিকট থেকে যে সম্পদ পেয়েছিলেন ছন্নছাড়া জীবনযাপনের কারণে তাও ইতোমধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় কবি কেবলই দেবীর সার্বক্ষণিক সাহচর্য প্রার্থনা করেন। কবি জানেন 'ভক্তি-ফুল আর নয়ন-জল' নিবেদন করে তিনি তাঁর আরাধ্য দেবীর সান্নিধ্য পেতে পারেন। তাই দেবীর উদ্দেশে কবির নিবেদন:

বিষয় ধনের নাই লালসা, করিনে কারো ভরসা,
কেবল মাত্র আশার আশা, থাকবো মিশে তব সাথে ॥
ভক্তি ফুল আর নয়ন জলে, ভজলে নাকি তোমায় মেলে,
দীন বক্স বলে অন্তিম কালে, পদরেণু দিও সাথে ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

শ্যামাকেই সকল দেবদেবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন কবি। অন্ধকার মন্দিরে শ্যামা যেন প্রদীপ শিখার মতোই উজ্জ্বল। তাঁরই কৃপায় কবিকণ্ঠে গীত হয় গান; তাঁর ভাবনায় বিভোর হয়ে কবি পান অলৌকিক আনন্দের সন্ধান। শ্যামার সান্নিধ্যে কবি যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছেন তার কাছে সংসারের সবকিছুই অসার ও মূল্যহীন:

শুদ্ধ শান্তভাবে করি আরাধনা,
ছাড়িয়ে সকল মনের কল্পনা,
নাহি কোনো আর ভাবি না সংসার,
বক্স কয় আর কিছু না জানি ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

আঠারো শতকের নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল কবি রামপ্রসাদ যেখানে ধর্মকে বাস্তবজীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছেন; দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট সংসার জীবনে সকল কষ্ট ও দুর্ভোগ মাথা পেতে নিয়েও জয় ঘোষণা করেছেন মানবের– 'এ সংসারে এনে মাগো করলি আমায় লোহাপেটা।/ আমি তবু কালী ব'লে ডাকি,/ সাবাস্ আমার বুকের পাটা'॥ (দাশগুপ্ত ২৩০) সেখানে খোদা বক্স সাঁই দেবীর নিকট শর্তহীন আত্মনিবেদনের মধ্যেই সন্ধান করেছেন মানব জীবনের প্রাপ্তি ও পূর্ণতা।

শ্যামাসাধনায় দেহসাধন-পদ্ধতির মিশ্রণ

প্রথাগত পূজা ও আচার-বিচার থেকে নজরুলের মতো খোদা বক্স সাঁইও নিজেকে রেখেছেন দূরবর্তী অবস্থানে। পূজার জন্য প্রয়োজনীয় ফুল– জবা, বেলি-বকুল, কিংবা মল্লিকা-মালতীর পরিবর্তে 'সরল অন্তর'কেই তিনি নিবেদন করতে চেয়েছেন দেবীর পদতলে। হৃৎপদ্মে শ্যামার জন্য আসন নির্মাণ করে সেখানে দেবীর নামে ধ্বজা ওড়াতে চান কবি। তাঁর এই বিচিত্র নিবেদন কখনো কখনো দেহসাধনার স্তরে উন্নীত হয়েছে। যেমন শ্যামার পূজাপ্রদান প্রসঙ্গে কবি বলেছেন:

এবার আমি যোগী হবো,
হৃদ মাঝারে মাকে রেখে মন আনন্দে পূজা দেবো ॥
বড়ো বড়ো ছয়টি অজা, তব নামে বলি দেবো,
ধুপ প্রদীপ জ্বেলে তোমার,
চরণে রক্তজবা দেবো ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

দেবীকে পাওয়ার আশায় কবি যোগসাধনা করতেও প্রস্তুত। দেহকে নিয়ন্ত্রণ তথা দেহসাধনার মাধ্যমে কবি ষড়রিপু বা কু-প্রবৃত্তিসমূহ ধ্বংস করে শ্যামার সাধনায় আত্মমগ্ন হতে চান। চর্যাপদে বৌদ্ধ সহজিয়া কবিরা যেমন দেহসাধনার মাধ্যমে বোধিচিত্ত লাভের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন খোদা বক্স সাঁইও তেমনি দেহসাধনার দ্বারা শ্যামামায়ের সান্নিধ্য পেতে চেয়েছেন। তান্ত্রিকদের মতো এই বাউল কবিও বিশ্বাস করেন 'এই দেহই

সত্যের মন্দির, সকল সত্যের বাহন'। এই দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে পারলে পাওয়া যায় পরম শক্তির সাক্ষাৎ। কবি এই দেহসাধনার পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন তাঁর গানে। যেমন:

পঞ্চইন্দ্রীয় পঞ্চপ্রদীপ করে,
আলো দেবো মণ্ডপ ঘরে,
মন আনন্দে দেব বলি বড়ো বড়ো ছয়টি অজা ॥
জ্ঞান ধূপ জ্বেলে করবো ধুমা,
সন্ধ্যারতি করবো উমা,
মনফুল আর গঙ্গাজলে, অঞ্জলি দেবো সুজাসুজা ॥ (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)

অর্থাৎ শ্যামার সান্নিধ্য অর্জনে প্রচলিত পূজাপদ্ধতি পরিহার করে খোদা বকস সাঁই অবলম্বন করেছেন নিগূঢ় সাধনার ব্যক্তিগত পথ।

উপসংহার

শ্যামাসংগীতের আদিকবি রামপ্রসাদ সেনের ভাবাদর্শ, লালন সাঁইয়ের বাউল মতবাদ, নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত সামনে রেখেই খোদা বক্স সাঁই শ্যামাসংগীত রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। শ্যামাসাধনার বিবিধ প্রসঙ্গ তাঁর গানে উচ্চারিত হলেও ব্যক্তিজীবনে খোদা বক্স সাঁই শ্যামাসাধক ছিলেন না; তাঁর উদার বাউল মতাদর্শও জীবনবিমুখ কোনো তত্ত্বকথা নয়। মানুষ ও সমাজই তাঁর সাধনপথের অবলম্বন। তিনি ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষকেই পরম-আরাধ্য মনে করেছেন। সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে সমাজপরিম-লে মানব-ঐক্যের প্রয়োজনে শ্যামাকে উপস্থাপন করেছেন মায়ের প্রতীক হিসেবে। যাতে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে সকলেই এক মায়ের সন্তান হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। ফলে এই শ্যামা যতটা না ধর্মীয় দেবী তার চেয়ে অনেকবেশি কবির ব্যক্তিমানস-সৃজনকল্পিত। খোদা বকস সাঁইয়ের কাছে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ-বিভেদ ছিল না। ধর্ম সম্পর্কেও তিনি ছিলেন খুব উদার। তিনি মানুষকেই উচ্চমূল্যে অভিষিক্ত করেছেন। তাঁর গানেও এ-বক্তব্যের সমর্থন লক্ষ করা যায় – 'মানুষ লীলা সব লীলার সার/মানুষ ভজলে হবে উদ্ধার/মানুষ ছাড়া আর কিছু নাই/মানুষে ঈশ্বর বর্ত্ত রয়।' (সাঁই *পাণ্ডুলিপি*)ফলে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে বাউল কবি খোদা বক্স সাঁই মানবকল্যাণ কামনায় উদ্বোধিত হয়েই শ্যামাসংগীত রচনা করেছেন। খোদা বক্স সাঁই তাঁর অসাম্প্রদায়িক কবিচৈতন্যের কারণেই ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে অর্জন করেছেন জনপ্রিয়তা। বাংলা শাক্তপদাবলির ধারায় তাঁর অবস্থান নিঃসন্দেহে গৌরবের।

গ্রন্থপঞ্জি

আমান, আবদুল আজিজ আল ও ঠাকুর, ড. ব্রহ্মমোহন (সম্পা.)। *নজরুল গীতি*। হরফ প্রকাশনী, ২০০৪।
গোস্বামী, করুণাময়। *সঙ্গীতকোষ*। বাংলা একাডেমি, ১৩৯১।
দাশগুপ্ত, শশীভূষণ। *ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য*। সাহিত্য সংসদ, ১৩৮৭।
মুস্তাফা, সাকার। *নজরুলের শ্যামাসাধনা ও শ্যামাসঙ্গীত*। অন্বেষা প্রকাশনী, ২০১৯।
সাঁই, খোদা বক্স। *হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি*, ১-১৯ অধ্যায়। (খোদা বক্স সাঁইয়ের পুত্র আবদুল লতিফ বিশ্বাসের নিকট রক্ষিত)
হক, খোন্দকার রিয়াজুল। *মরমী কবি খোদা বক্শ শাহ* ।বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭।

পরিশিষ্ট
খোদা বক্সের শ্যামাসংগীত

১

আর ডেকো না মা মা বলে,
মা আছে কি নাই ভূমণ্ডলে ॥
থাকিলে মা দিত দেখা, ডাকাডাকি আর লাগতো না,
ব্রহ্মাণ্ড করিছে পালন লোভের বশে তাই দেখ না ॥
মা সবার অন্তরে আছে, যার যেমনি বিশ্বাস তেমনি পায় সে,
কেহ ভাবছে বসে বসে যখন যা তার মনে বলে ॥
জলে স্থলে ফলে ফুলে, চিন্তা করলে সর্বস্থানে মেলে,
অবিশ্বাসে হাজার ডাকলে, মা আসে না কোন কালে ॥
ভক্তি বলে নয়ন জলে ডাকলে, মা দেয় না ফেলে,
হৃদ পদ্ম রক্তজবা দিয়ে ডাক দীন এই বক্স বলে ॥

২

মায়ের বদন মনে পড়ে,
ও মা বাসুক না বাসুক ভালো
তবু ঐ চরণে থাকবো পড়ে ॥
কি দিয়ে যে করবো পূজা, পাইনে আমি দেহ ধুড়ে,
মন ফুল আর নয়ন জলে, অঞ্জলি দিই সকল ছেড়ে ॥
অভয় চরণ দেখবো বলে, মা আছি কেবল পথে পড়ে,
দশ ছয় এই ষোল জনা, তারা আমায় দেয় না ছেড়ে ॥
রক্ত জবা কোথায় পাব রাঙ্গা পদে অর্ঘ্য দেব,
হৃদ পদ্মে রাখবো মাগো দীন বক্সর এই ভাঙ্গা নীড়ে ॥

৩

ও মা কতদিন দেখিনি তোমায়,
দীপাবলিতে এসে মা আবার লুকাইলে কোথায় ॥
দেখা নয়ন দেও নাই আমায়, মনের বনে তাইতে হারায়
কৈলাশে কি কাশী আছ মা, খুঁজে তোমায় পাইনে কোথায় ॥
কামাখ্যা মন্দিরেতে মা, গেলাম তোমার দেখার আশায়,
লাল বস্ত্র নিয়ে ঘুরে আসি মা, মেলা দেখে সকলি হারায় ॥
কৃপা করে যদি আস মা, আমার এই ভাঙ্গা আঙ্গিনায়,
দীন বকস বলে হৃদ কমলে, সযতনে রাখবো তোমায় ॥

৪

ও মা কি দিয়ে আর বাসবো ভালো,
কিছু নাই মা আমার হাতে,
গুরু যে ধন দিয়েছিল হারিয়েছি পথে পথে ॥
বিষয় ধনের নাই লালসা, করিনে কারো ভরসা,
কেবল মাত্র আশার আশা, থাকবো মিশে তব সাথে ॥
জলে কি জঙ্গলে থাকি, যেন সর্বদা তোমাকে দেখি,
সঙ্গ ছাড়া করো না মা এই বাসনা জাগে চিত্তে ॥
ভক্তি ফুল আর নয়ন জলে, ভজলে নাকি তোমায় মেলে,
দীন বক্স বলে অন্তিম কালে, পদরেণু দিও সাথে ॥

৫

সুমধুর লাগে মায়ের হাসি,
শুভ্র দন্ত নীল কমল লোচন, ললাটেতে পূর্ণ শশী ॥
সুচাচুর চিকুর কেশ, এলায়ে হও রণঙ্গিনী বেশ,
কুচ যুগ শোভা কি বা আভা, যেন নক্ষত্র পড়িছে খসি ॥
এক হস্তে অভয় দেও মা আরাক হাতে ধর অসি,
অশুর নিধন কর গো মা, মুণ্ড কাট রাশি রাশি ॥
দুটি উরু কদলি তরু, বলব কি আর তাই প্রকাশি,
দীন বক্স বলে রাঙ্গা পদে মা লাল জবা দেব
আর মন তুলসী ॥

৬

প্রাণ ভরিয়ে ডাকবো মা গো,
এই বাসনা মনে করি,
ডাকবার সময় হয় না আমার,
মিছে মায়ায় ঘুরে মরি ॥
শিশু যেমন মাকে ডাকে
মা ছাড়া জানে না কাকে,
শিশুর মতো করে আমাকে,
পথে নিও হাতে ধরি ॥
মা কথা মমতা যুত,
ডাকলে কোলে নেয় সে সুত,
কুপুত্র অনেক হয়তো
কুমাতা নাই বরাবরি ॥
ভুলে আছি ভূমণ্ডলে
মাগো আমি তোমায় ফেলে,
দীনহীন এই বক্স বলে ঝরে কেবল নয়ন বারি ॥

৭
নিরানন্দ করিস নে মা শুন গো আনন্দময়ী ।
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে তুমি আছ চিরস্থায়ী ॥
তোমার ভাবে থাকে যারা, মণিহারা ফণী পারা,
দেখলে দুটি নয়ন তারা মনে হয় সে জগন্ময়ী ॥
কোন ফুলে সন্তুষ্ট তুমি, ভেবে গুনে পাইনে আমি,
তুমি তো মা অন্তর্যামী এই দীনহীনের স্নেহময়ী ॥

৯
ও মনি মতো দিস মা সাড়া মা বলিয়ে ডাকলে পরে,
ভজন সাধন জানিনে মা বসে আছি এই ভাঙ্গা মন্দিরে ॥

বুঝিনে মা তোর অর্চনা, কেবল করি আনাগোনা,
মনে করি এই ভাবনা, ফেলে যেন দিসনে দূরে ॥
নাইকো জবা বেলি বকুল, নাই মল্লিকা মালতী ফুল,
তাইতে ডাকি হইয়ে আকুল, কেবলি সরল অন্তরে ॥
মা তোর রূপেতে থাকি মগন, ছেড়ে দিয়ে সব জ্বালাতন,
মনমোহিনী দিও দর্শন, দীন বক্স আছে ঐ রূপ ধরে ॥

১১
এবার আমি করবো পূজা,
হৃদপদ্মে আসন পাতিয়ে, উড়াইব নামের ধ্বজা ॥
পঞ্চইন্দ্রীয় পঞ্চপ্রদীপ করে,
আলো দেবো মণ্ডপ ঘরে,
মন আনন্দে দেবো বলি বড়ো বড়ো ছয়টি অজা ॥
জ্ঞান ধূপ জ্বেলে করবো ধুমা,
সন্ধ্যারতি করবো উমা,
মনফুল আর গঙ্গাজলে, অঞ্জলি দেবো সুজাসুজা॥
তিন রতিকে তিল করিয়ে,
তাহে লালসা মধু দিয়ে,
মন তুলসী জবা ফুলে বক্স কয় দিই ভক্তির বোঝা ॥

৮
যদি মন মায়ের দাবি করবি পূরণ,
আগে নিষ্ঠা ভক্তির কর আয়োজন ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ সকল,
ছেড়ে দেও গে সে সব গণ্ডগোল
লক্ষ রেখে সে চাঁদ বদন, সম্বল মাত্র অভয় চরণ ॥
শুদ্ধ মতি ভক্তি দিয়ে থাক ঐ রূপ স্মরণ লয়ে,
কৃপাময়ীর কৃপা হলে পরে
ঘুচে যাবে এই ভব বন্ধন ॥

ও মন ধুলা খেলায় আছিস মগন,
মা ডাকলে রইতে পারবিনে কখন,
ফেলে রেখে সব আয়োজন যেতে হবে নিজ নিকেতন ॥

তুই আমার যা শিখাবি মা,
তাই হবে উপাসনা সাধনা, তন্ত্র মন্ত্র কিছুই জানিনে,
দীন বক্স রয় নাম রসেতে মগন ॥

১০
মাগো তব পদে এই নিবেদন,
যদি তোমার ছায়ায় রাখ আমায়,
শান্তি পাব যাবৎ জীবন ॥
চাইনে মা তোর টাকা কড়ি, রাজ প্রাসাদ কি স্বর্ণ আভরণ,
চাই কেবল ওই যুগল চরণ যা ভোলানাথ করে বক্ষে ধারণ ॥
অশুর নিধন কর মাগো, নিজ হাতে ধরে অসি কখন,
ভক্তগণকে অভয় দেও মা, ভয় ক'রোনা তোমরা কখন ॥
একা কৈলাশেতে থাক মাগো হয়ে বনবাসিনী মতোন,
দীন বক্স বলে রাঙ্গা চরণ কমলে, রক্তজবা দিলাম উপঢৌকন ॥

১২
মা যে আমার রূপের রাণী, রজত কাঞ্চনমণি,
শ্যামল অঙ্গেতে নীল অম্বর,
অপরূপ কি শোভা জানি ॥
কমল লোচনে কাজলের আভা, অপূর্ব কি রূপের শোভা,
দু'টি বাহু বেলনা কাটা,
জবা ফুলের মতো হাত দু'খানি ॥
দু'টি উরু কদলি তরু আকার, ক্ষীণ কটিতটে কি যে সুবাহার
কমল চরণে তিল কি চমৎকার,
হেঁটে যায় রাজহংসিনী ॥
যে দেখেছে সেই চাঁদেরে, পড়েছে সে বিষম ফাঁদে,
ঐ রূপ সদা অন্তরে রেখে,
দীন বক্স চলে দিন রজনী ॥

১৩
মাগো একা বসে থাকবো কত,
মাতৃহীন বালকের মতো ॥
দেখলে মায়ের চরণ, ভব ব্যাধি হয় নিবারণ,
করেছি আত্মসমর্পণ, এ দেহের সম্পদ মতো ॥
চলার পথে তুমিই সম্বল, ঐ রূপ নিয়ে থাকি কেবল,
মুখে শুধু বলি 'মা' বোলে, তব পদে হয়ে নত ॥
ও মা তুমিই আমার মনের দর্পণ চাইনে ভেবে আর কোনো ধন,
দীন বক্সের এই বিনয় বচন, উপাসনায় থাকবো রত ॥

১৪
আমার মায়ের তো লাগে না গয়না,
শ্যামল সুন্দর তনু,
সোনার কণ্ঠেতে গান গায় সে ময়না ॥
অঙ্গেতে নাই কোনো আভরণ,
ভাবে বিভোর সর্বক্ষণ, হরে নেয় কত মুণির মন,
সরল সুঠাম সে তনু খানা ॥
নিরাভরণে চলে পথে, প্রেমানন্দে থাকে মেতে,
মায়া ভরা কমল লোচনেতে,
পঙ্কজ বদনাখানা ॥
মহাভাবের হয় ভাবিনি, বলবো কি তার গুণ বাখানি,
অন্তরে তার সোনার খনি,
দীন বক্সের ভজন সাধনা ॥

১৫
গেল দিন বাজে কাজে,
তোমার ডাকি মা শঙ্করি, যখন মনে করি,
কুচিন্তা কুমানুষ বিরাজে ॥

মাগো তোমায় লয়ে যখন বসি উপাসনায়,
কত বাঁধা বিপত্তি উদয় হয়,
কিছু থাকে না স্মরণ হয় বিস্মরণ,
মন উচাটন পাইনে তোমায় খুঁজে ॥

এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সাধনার সার,
তোমা বিনে কিছু দেখিনাকো আর,
আশার সংসার ভাবি অনিবার,
থাকিতে চাই আমি তোমাতে মজে ॥

যত বাঁধা আসে মা তোমাকে ছাড়বো না,
কেবল মাত্র তুমিই উপাসনা,
হৃদয় মন্দিরে রাখিয়ে তোমারে,
দীন বক্সর আনন্দ তোমাকে পূজে ॥

১৬
এবার আমি যোগী হবো,
হৃদ মাঝারে মাকে রেখে মন আনন্দে পূজা দেবো ॥
বড়ো বড়ো ছয়টি অজা, তব নামে বলি দেবো,
ধূপ প্রদীপ জ্বেলে তোমার,
চরণে রক্তজবা দেবো ॥
মনফুল আর নয়ন জলে, তব পদে সিঞ্চন করিব,
বেদীতে রাখিয়ে তোমায়,
দুই নয়ন ভরে তাই দেখিব ॥
কৈলাশেতে ছিলে তুমি, মা তুমি অন্তর্যামী,
দীন বক্স বলে অন্তিমকালে,
তোমায় আমি না ভুলিব॥

১৮
মা বলে ডাক মধুর মতো,
রাঙ্গা পদে রেখে ভক্তি, ডাকি মা তোর আবিরত ॥
ভুবন মোহন রূপ যে তোমার,
সকলের মা হও নিরন্তর,
বাবার ও মা মায়ের ও মা ভাইয়ের ও মা আদ্য মাতা ফাতেমা নামতো ॥
যে জেনেছে তোমার সন্ধান,
দূরে গেছে তার সকল অজ্ঞান,
খুলেছে তাই জ্ঞানের নয়ন, হয়ে আছে পদানত ॥
মা গো তোমায় ডেকে সাধ মেটে না,
তুমিই আমার উপাসনা,
অধীন বক্সর এই ভাবনা, জানি তোমায় সত্য সত্য ॥

১৭
সন্ধ্যা সমীরণে বসে বাতায়নে, দেখিতেছি তব ছবি,
ভাবেতে বিভোর হইয়ে এবার,
তন্ময় হয়ে তাই ভাবি ॥
নয়ন কমলে কাজরেরি আভা,
অপরূপ সে কি রূপের শোভা,
দেখলে জুড়ায় প্রাণ, ভোলে দেহ মন,
থাকে না জ্বালাতন অপরূপ সেথাবি ॥
সুনির্মল তনু, শ্যামল সুন্দর,
কমল মৃণাল সম বাহুদল,
মহাভাবের ভাবিনী বলবো কি বাখানি,
প্রেমানন্দে মগন রাত্র দিবা কি ॥
পঙ্কজ বরণী মধুর হাসিনী,
মুক্তা ঝরে দন্তে ভাবের ভাবিনী,
করে মন প্রাণ সমর্পণ তাহারই কারণ,
দীন বক্স সর্বক্ষন করে তার সেবি ॥

গ্রন্থপঞ্জি

সাঁই, খোদা বক্স । হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, ১-১৯ অধ্যায় । (খোদ বক্স সাঁইয়ের পুত্র আবদুল লতিফ বিশ্বাসের নিকট রক্ষিত)